আমাদের নন্দনতত্ত্ব

প্রীতিগোপাল দত্তরায়

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্তে পুষণ্ণপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে"— হিরণ্ময় পাত্রের আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে রয়েছে সত্যের স্বরূপ। হে পুষণ সেই আচ্ছাদন তুমি অপাবৃত কর। আমি সেই সত্য প্রত্যক্ষ করতে চাই—যে সত্য ধর্মরূপে সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে রয়েছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্য-ভিসংবিশন্তি।" —একমাত্র আনন্দ হতেই সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের জন্ম ও জীবন এবং আনন্দেই সবকিছুর পরিণতি।

বস্তুত এই আনন্দই সেই একক ও অনির্বচনীয় সত্য। এই সত্যই ধর্ম—যা বিশ্ব-চরাচরের ধারণপালনপোষণকারী নিয়ন্ত্রণী শক্তি—বৈদিক পরিভাষায় যার নাম 'ঋত'। এই আনন্দ বা ধর্ম বা ঋত—ভারতীয় জীবনসাধনার এটাই হল পরম ও চরম মর্মকথা। ভারতীয় দৃষ্টিতে, শিল্পসাধনা হল সমগ্র জীবনসাধনার অন্যতম ফলিত রূপ। তাই, যৌক্তিক পরম্পরায়, ভারতীয় শিল্পসাধনার মর্মকথাও হল এই আনন্দ বা ধর্ম বা ঋত। এই আনন্দই ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের উপায় ও উপেয়। শিল্পের ভুবনে এই আনন্দের-ই অপর অভিধা—রস। রসো বৈ সঃ। শিল্পের মাধ্যমে সেই রসই সহৃদয়হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাই একে বলা হয় 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'।

জীবন-আনন্দ-শিল্প এই সূত্রের স্বীকৃতি আমরা পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শিল্পের এক বিশিষ্ট পরিভাষায়: 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। আত্মসংস্কৃতিই হল সমস্ত শিল্পকর্মের আসল কথা। মানুষের দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সমন্বয়সূত্রে যে আত্মা, তার সংস্কৃতির অর্থ হল—সমস্ত তুচ্ছ ও তাৎক্ষণিক সংবেদনের ভিতর দিয়ে তার স্বরূপসত্তার উন্মোচন উদ্‌ঘাটন ও সমুজ্জ্বল প্রকাশ। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। নামরূপে অভিব্যক্ত আত্মাই শিল্পের প্রাণ। শিল্পীর ব্যক্তি-আত্মা শিল্পের মাধ্যমে বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তাই তখন শিল্প হয়ে ওঠে সর্বজনীন। শিল্পীসত্তার এই উত্তরণ—ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, ভূমি থেকে ভূমায়—যে উপলব্ধি বহন করে আনে তাই হল আনন্দ। অথবা, বলা যায় আত্মসংস্কৃতি বা শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী সেই পরম সত্যধর্ম আনন্দের সমীপবর্তী হন, প্রত্যক্ষ করেন।

ভারতের সনাতন ধ্যানের বস্তু—জীবন। জীবনের প্রকৃত ও পরম অর্থকে আবিষ্কার করা—এই হল ভারতের জীবনসাধনা। ভারত মনে করে—গোটা জীবনটাই একটা শিল্প, এবং শিল্পের কর্ম হল—জীবনের সত্যস্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করা। আনন্দই সেই স্বরূপ। এই আনন্দে সুখ-ও আছে, দুঃখ-ও আছে। মিলন-ও আছে, বিরহ-ও আছে। হাসি-ও আছে, কান্না-ও আছে। সমস্ত বিপরীত যুগলেরই সেখানে

সহাবস্থান—এক সর্বান্তরশায়ী সত্যের মহিমায় সমাহিত এক পরম বোধের অনুবেদনায়। এই পরম বোধই আনন্দ। সকল খণ্ডিত বাস্তব-ই সেখানে আছে, কিন্তু আছে অখণ্ড সত্যের পূর্ণতায়। তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই। এই হল আনন্দ। সসীমকে অসীমের বিস্তারে, খণ্ডিতকে অখণ্ড পূর্ণতার আলোকে, ক্ষুদ্রকে বৃহতের প্রেক্ষাপটে যে অবেক্ষণ তাই আনন্দের নিধান।

অতএব দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের শিল্প তথা জীবনসাধনার মর্মবস্তু যে আনন্দ—তা ভারতীয় মনীষার লক্ষ্যবস্তু সত্যের অপর নাম। আবার এই আনন্দ-সত্যের মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা শিব ও সুন্দর যুগলদেবতার। এই শিব হল সেই কল্যাণ—প্রতিক্ষণের হাজারো স্খলন-পতন-ত্রুটি, চ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা, দুরিত ও দুর্গতি পরিণামে যে মহাক্ষেমংকর ধ্রুবলোকে গিয়ে শাশ্বত উত্তরণ লাভ করে। এই সুন্দর হল সেই বিশ্বমোহন সুষমা যেখানে সুশ্রী ও বিশ্রী সমস্তই এক অদ্রোহী মিত্রতায় সমাহিত। সেই আনন্দলোকের মঙ্গলালোকে ওই সত্যশিবসুন্দরের সাক্ষাৎকারই ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের অন্বেষা।

বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এসবের সঙ্গে শিল্পের প্রকরণ ও প্রক্রিয়াগত বৈসাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক বিরোধের অস্তিত্ব ভারতীয় চিন্তাধারায় স্বীকৃত নয়। বহু বিশেষের মধ্যে যে সামান্য সত্যের অস্তিত্ব তাকেই আবিষ্কার করে বিজ্ঞান; কিন্তু প্রতিটি বিজ্ঞান-প্রস্থানের ক্ষেত্র বা গণ্ডী স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট। বিজ্ঞান যে সত্যগুলিকে খুঁজে বার করে, দর্শন তাদের সবগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে এবং সমগ্র জীবনের সঙ্গে তাদের সুসঙ্গতি স্থাপনা ক'রে একটা সার্বিক মহাসত্যের দ্বারে পৌঁছুতে চেষ্টা করে। তারই পথ ও পাথেয় নির্ধারণ করে দেয় তর্কশাস্ত্র। নীতিশাস্ত্রের কাজ হল—মানুষের ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবন যাতে করে সুশৃঙ্খল, কল্যাণময় ও শুভপ্রসূ হতে পারে তার বিধিবিধান পরিশীলিত ধীশক্তির দ্বারা অধিগত করে সকলের জন্য অনুশাসনিক শৈলীতে উপস্থাপিত করা। প্রভুসম্মিত অথবা সুহৃৎসম্মিত উপায়ে অনুচিতের পথ পরিহার করে উচিতের পথে অনুপ্রাণিত করাই নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য।

শিল্পের প্রকরণ হল মানুষের সর্বজনীন ও সমগ্র চিৎসত্তা, প্রক্রিয়া হল কল্পনা ও কারুকৃতি এবং কলাকৌশলগত চারুতা। এখানেই বৈসাদৃশ্য।

কিন্তু শিল্পের লক্ষ্য-ও হল সত্য—যে সত্যের স্বরূপ হল আনন্দ। শিল্পকলার মাধ্যমে যে কল্যাণবোধনা জাগ্রত হয় তার গভীরতা ও নিবিড়তা এবং বিস্তৃতির মাত্রাগত ও গুণগত পরিমিতি বিশালতর। যে প্রাণশক্তি ও প্রেরণাসম্বেগ শিল্পকলা থেকে সঞ্চারিত হয় তার দ্রাবণ ও সঞ্জীবন শক্তি অনেক বেশি তীব্র, ত্বরিত ও অমোঘ।

জগৎ ও জীবনকে বিভিন্ন দার্শনিক তাঁদের নিজ নিজ বোধ ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেন। তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের অনুবেদন

ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন। দার্শনিকদের ভাবস্পন্দন, ভাষা ও ভাষ্যও ভিন্ন রকমের। জগৎ ও জীবনকে নিয়েই শিল্পীদেরও কারবার। শিল্পীরাও নানা রূপে পরিবেশন করেন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন আলেখ্য। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে ভিন্নতা তা একান্তই বাহ্য। তদতিরিক্ত যে সত্য তার নাম আনন্দ—তা কিন্তু অভিন্ন। তার স্ফুরণ সৌন্দর্যের ছটায়। কীটসের কথায়—Truth is Beauty, Beauty Truth। এই সুন্দরই শিব—এবং তাই শান্তি। শিল্পী ও ঋষি—উভয়ের কণ্ঠেই তখন একই বাণী—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ......। বিশ্বময় ছড়ানো অজস্র বস্তু ও তথ্যসম্ভার মন্থন করে যে অভিজ্ঞতার জন্ম হয় তা অনির্বচনীয়। দার্শনিক ও শিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। ব্রাডলি থেকে ডিউই সবারই এই মত। ওই অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরস্থ রহস্যের উদ্‌ঘাটন ঘটে—দর্শনে এবং শিল্পেও। দর্শনে এই উদ্‌ঘাটন আংশিক এবং শিল্পে তা সার্বিক। সর্বভূতান্তরাত্মা, সকল সৃষ্টির অন্তরাবশায়ী অনির্বচনীয় একক সত্তার উপলব্ধির মাধ্যমে দর্শন মানবমনকে নিয়ে যায় মুক্তির দ্বার পর্যন্ত, আর শিল্পীর শিল্পলোকে ঘটে তার পূর্ণাঙ্গ মুক্তি। সেই মুক্তিই আনন্দ—তাই পরম সত্য। আর এই সত্যেই সুন্দর ও শিবের প্রকাশ। সেই মহান একের সঙ্গে, সেই সীমাহীন মহাসত্তার সঙ্গে একাত্মতার তন্ময়তায় দার্শনিক ও শিল্পী উভয়েই হয়ে ওঠেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি, আনন্দময় ব্রহ্ম, সুন্দরের আলোকে দিব্যদ্যুতিময় ঈশ্বর, বিশ্বময় মহাশৃঙ্খলারূপী যে মহামঙ্গল—তারই অখণ্ড প্রভাববৈভবে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ সত্তা—অন্যের অন্তরেও সঞ্চারিত হয় সেই মহাভাব দর্শনের ভাষায়, শিল্পীর সৃষ্টিতে। শিল্পের মাধ্যমে এই সঞ্চার অনায়াসতর, গভীরতর, নিবিড়তর এবং অনেকটা অধিক—যার নাম আনন্দ—যা হৃৎতন্ত্রে এবং যন্ত্রণাময় জীবনযন্ত্রে অনুস্যূত হয়ে জর্জরিত বদ্ধ জীবনের মধ্যেও নির্জর অমর এক মুক্ত মহাজীবনের জন্মদান করে। প্লোটাইনাশের কথার সঙ্গে অল্প কিছু সংযোজনের যোগফল—এই কথাতেই এসে দাঁড়ায়। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা বোধ হয় এটাই।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে যেহেতু শিল্পকৃতি হল আত্মসংস্কৃতি, সেই হেতু শিল্পপ্রতিভা হল নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা ও অঘটনঘটনপটীয়সী। আমাদের ইন্দ্রিয়পরিচ্ছিন্ন লোকায়ত জীবনের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে যা ঘটে চলেছে তাকেই আমরা বলি বাস্তব। শিল্পে এই বাস্তব অবশ্যই বর্জনীয় বস্তু নয়—একান্তই স্বীকার্য ও অবলম্বনীয়। কিন্তু শিল্প বাস্তবসর্বস্ব নয়—বাস্তব সেখানে অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনা রসের সঙ্গে জারিত হয়ে এমন এক সৃষ্টিকে বাস্তব করে তোলে যা বাস্তব বা নিয়তির রাজ্যের নিয়মকেও অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয় এক বিচিত্র লোকোত্তর অনুভূতিলোকে—যাকে অঘটন বলে। আর তা না হলে, তা নেহাৎই ইতিহাস অথবা আলোকচিত্র অথবা বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনমাত্র অথবা বড় জোর একটা সুচারু বিশ্লেষণ। শিল্পে বস্তুজগৎ ভাবলোকে এবং তা থেকে মহাভাবলোকে এক অভিনব রূপে প্রকাশ লাভ করে, আবার অনেক সময় ভাব ও কল্পনার জগৎও এবং অনৈতিহাসিক বস্তুও শিল্পায়িত হয়ে বস্তুজগতের সীমানায়

এসে বাস্তবতার স্পষ্টতা ও তীব্রতা অর্জন করে। তাই শেক্সপীয়র ও দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুভিত্তিক নাটকগুলিও যেমন শিল্প, ইবসেন—রবীন্দ্রনাথের ভাবভিত্তিক লেখাগুলিও তাই। রামজন্মের আগেই রামায়ণ তাই শিল্প হিসেবে ব্যর্থ নয়। মিলটনের Paradise Lost রূপকথাভিত্তিক হয়েও উৎকৃষ্ট শিল্প। এদের সংবেদন চিরন্তন—বস্তুজীবনের মতো এরাও অত্যন্ত পরিচিত। কোনোটাই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়।

অনেকে মনে করেন—Art for Art's sake। 'Art for Man's sake' কথাটা শিল্পতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্বের বহিরঙ্গমাত্র অথবা পরিপন্থী। ভারতবর্ষ মনে করে—যদিও শিল্প এক অনির্বচনীয় রসলোকের বস্তু, তবু সমাজ-সচেতনতা, যে কোনো সৃষ্টির মতোই, শিল্পসৃষ্টিরও একটি অপরিহার্য প্রেরণা ও প্রয়োজন। সমাজবিমুখ কল্যাণ নিরপেক্ষ নিতান্তই নৈর্বিকল্পিক কোনো কর্মই ভারতবর্ষ কোনোদিন সমর্থন করেনি। যে কর্ম উৎসভ্রষ্ট গণ্ডীবদ্ধ অহিতকর অথবা হিতবুদ্ধিবর্জিত, একান্তই আত্মনিষ্ঠ—সেই কর্মকে ক্ষুদ্র ও মিথ্যা বলে ভারতবর্ষ চিরদিনই তিরস্কার করেছে। তাই ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে শুধু 'আমি' নয়, 'তুমি-আমি' সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য। তাই, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে, শিল্পীর সৃষ্টি শুধু শিল্পীর জন্য নয়, অথবা শুধু তাদের জন্য নয় যারা জীবন থেকে পলায়নবৃত্তিচতুর, যারা নিভৃত ভাবনিলয়ে নিঃসঙ্গ রসবিলাসের অভিসারী। সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে, অবশ্যই শিল্পের ভিতর দিয়েও, ভারতীয় শিল্পীর চিরানুস্যূত এই এষণা—'সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥'[১] তাই ভারতীয় সাহিত্যে সহভাব বা সাযুজ্যের মাধ্যমে হিতসাধনার প্রবর্তনা। তাই ভারতীয় নাট্যরচনায় প্রায়ই ঈশ্বরোপসনায় শুরু, ভরতবাক্যে শেষ—উৎসচেতনাসহ রাজা প্রজা জনসাধারণ সর্বভূত ও ভূতধাত্রী পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনাই যার তাৎপর্য। তাই ভারতীয় নাট্যে সমস্ত 'নেতি'র মধ্য দিয়ে ইতিবাচকতার প্রতিষ্ঠা। তাই নবরসের রুচিরবিন্যাসের মাধ্যমে পরিণামে নীতি ও ও সত্যের জয়বার্তাই ভারতীয় সাহিত্যের অন্বিষ্ট। সীমিত জীবনকে অসীমের প্রেক্ষায় প্রত্যক্ষ করলে, সমস্ত বিচ্ছেদ মিলনে পর্যবসিত হয়—পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের এই ফলশ্রুতির পরিচিতিই 'মিলনান্তক' নাটকে সুপরিস্ফুট। তাই কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটককে পঞ্চম অঙ্কে শেষ না করে সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়েছেন কবি। একান্তই আত্মোপলব্ধির প্রকাশ হলেও, শিল্প যে বহুজনের প্রাণে এক অতি শক্তিশালী প্রেরণা ও শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করে—তা অনস্বীকার্য। যুগবিপ্লবে রুশো, ভলটেয়ার, তলস্তয়, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে এই সত্যটি সুপ্রকট। কাব্যধর্মী ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা যে বিনয়-বাদল-দীনেশকে সৃষ্টি করেছে তা আমরা ভুলি কী করে ? তাই ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে সবসময়ই বলা হয়েছে—'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'[২] এই শিক্ষাই যেন প্রতিষ্ঠা পায় সাহিত্যে। সাহিত্যিক শুধু শিক্ষক নন—কিন্তু শিক্ষাদানও তাঁর কাজ…তবে সেই শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিটি ভিন্ন। সেটি হবে কান্তার মতো ললিত পন্থায়। কাব্যের ফল সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশকার

মম্মটভট্ট পরিষ্কার করেই বলে দিলেন—কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর-ক্ষতয়ে সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।—কাব্যকর্তা এবং কাব্যের শ্রোতা ও দ্রষ্টা এই উভয়ের লাভ—একাধারে যশ ও অর্থ ও লৌকিক জ্ঞান এবং সাক্ষাৎ পরমা নির্বৃতি, অমঙ্গলের বিনাশ ও কান্তাসম্মিত হিতোপদেশ। কবিকে একজন অলস কল্পনাবিলাসী পলাতক প্রান্তিক অপ্রাকৃত স্বৈরাচারী হিসেবে ভারত দূরে সরিয়ে রাখেনি। ভারতের সমাজ-মঞ্চে কবির এক বিশিষ্ট নির্দিষ্ট সমাদৃত স্থান—কবি সেখানে ক্রান্তপ্রজ্ঞ সত্যদ্রষ্টা স্রষ্টা—জনমানসের মহানিয়ামকশক্তিকেন্দ্র রূপে তাঁর এক গৌরবদীপ্ত গম্ভীর স্থান।

ভারতের প্রথম কাব্য—ঋগ্‌বেদ। মুখ্যত ধর্মগ্রন্থ হলেও কাব্যসুষমায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। ভিন্টারনিৎসের কথায়—কাব্যকলার নিদর্শন হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে ঋগ্‌বেদের একটি অগ্রগণ্য স্থান অনস্বীকার্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সঙ্গীত এবং কাব্য—এ সবই শিল্প। এ সবেরই সুপ্রচুর আলোচনায় ভারতীয় মনীষা সুসমৃদ্ধ। কাব্যজিজ্ঞাসা সম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচশোরও অধিক। ওগুলো বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। আরও আলোচনাগ্রন্থ এবং তাদের টীকাভাষ্যের সংখ্যা ধরলে—আরও অনেক। বিভিন্ন শিলালিপির দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের বিকাশ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে অথবা তার বেশ কিছু আগেই একটা পরিচ্ছন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে। উত্তরকালের শিলালিপি ও কাব্যগ্রন্থাদির দৃষ্টান্ত থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে—খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কাব্যকলার উপাদান হিসেবে বহু অলঙ্কার ও গুণ, কাব্যের প্রকার ও কবিশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক ধারণা একটা সুস্পষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং দণ্ডী ও ভামহকৃত সুনিবদ্ধ কাব্যশাস্ত্র গ্রন্থের প্রকাশও কাব্যজিজ্ঞাসার ধারাকে একটা সুস্পষ্ট মাত্রা দান করেছে।

আলোচ্যমান শাস্ত্রের প্রাচীন নাম কাব্যালঙ্কার। ভামহ, বামন ও রুদ্রট এই নামেই শাস্ত্রকে আখ্যাত করেছেন। অলঙ্কার শব্দের দুটি অর্থ—উক্তিবৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য-মণ্ডিত চমৎকারজনক উক্তি। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৭ম / ৮ম শতকের পরে কাব্যশাস্ত্রের অপর নাম দেখা যায়—সাহিত্য। 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'[৩]—কাব্যলক্ষণে উক্ত এই শব্দার্থসাহিত্যের নিরিখেই শাস্ত্রের নামও হয় 'সাহিত্য'। ড: রাঘবনের মতে, দণ্ডী ও ভামহের পূর্বে এই শাস্ত্রের নাম ছিল 'ক্রিয়াকল্প'—যদিও ড: কানে এই মত স্বীকার করেন না।

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের বিষয় বহু ও বিচিত্র। তাই বলে প্রতিটি শাস্ত্রগ্রন্থে যে আলোচ্য প্রতিটি বিষয়ই আলোচিত হয়েছে তা নয়। সাহিত্যদর্পণ, প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ এই কয়েকটি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রসহ সমুদয় বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্র, ভামহ, রুদ্রট ও বাগ্‌ভটের কাব্যালঙ্কার, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্র বাদে প্রাসঙ্গিক অপর সকল বিষয়েরই পর্যালোচনা দৃষ্ট হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং ধনঞ্জয়ের দশরূপক নাট্যশাস্ত্র ও রসতত্ত্বের

বিবরণে সীমাবদ্ধ। শুধু অলঙ্কারের আলোচনা রয়েছে অনেকগুলি গ্রন্থে—যথা অলঙ্কারসর্বস্ব, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি। ধ্বনিতত্ত্বের উপর রচিত ধ্বন্যালোক (আনন্দবর্ধন), বক্রোক্তির উপরে বক্রোক্তিজীবিত (কুন্তক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শব্দশক্তি এবং রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নামকরা বই আছে। এছাড়াও আরও নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রয়েছে।

কাব্যশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তুসামগ্রীর একটি হল কাব্যপ্রয়োজন। বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে যেটি প্রধান তা হল—প্রীতি বা আনন্দ। নাট্যশাস্ত্রকার, ভরত তাই বলেছেন—'ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ'।[৪] আরও বলেছেন—'বেদবিদ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্। বিনোদজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি॥'[৫]—'তথাপি প্রীতিরেব প্রধানং⋯প্রাধান্যেনানন্দ এবোক্তঃ'[৬] (লোচন)—'প্রীত্যাত্মা চ রসস্তদেব নাট্যম্'[৭] (লোচন)। কাব্যপ্রকাশকার খুলেই বললেন—'সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্।'[৮]

কাব্যহেতু—এটিও ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের অন্যতম বিষয়। এ বিষয়ে অনেকেরই এই মত যে—প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস এই তিনটি মিলিতভাবে কাব্যের হেতু। —'নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহু নির্মলম্। অমন্দশ্চাভিযোগঃ স্যাৎ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥'[৯] (দণ্ডী)—'শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ। কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে॥'[১০] (মম্মট)। অনেকের মতে—প্রতিভাই একমাত্র হেতু। 'সা (শক্তিঃ) কেবলং কাব্যে হেতুরিতি যাযাবরীয়ঃ'[১১] (রাজশেখর); 'প্রতিভৈব চ কবীনাং কাব্যকরণকারণম্। ব্যুৎপত্ত্যভ্যাসৌ তস্যা এব সংস্কারকারকৌ ন তু কাব্যহেতুঃ।'[১২] (বাগ্ভটের অলঙ্কারতিলক); তস্য চ 'কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা'[১৩] (রসগঙ্গাধর)।

কাব্যশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল—কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের কাব্যত্ব, কাব্যের স্বরূপ, কাব্যের আত্মা—এই নিয়ে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে বহু ভাবনাচিন্তা হয়েছে। কাব্য হতে গেলে অবশ্যই কী চাই, কাকে কাব্য বলবো—এ সম্বন্ধে বহুজনের বহু মত ভিড় করে আছে কাব্যশাস্ত্রের আসর। সূচনা থেকেই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত কাব্যের ব্যাপারে শব্দ ও অর্থের উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধরনের কাব্যলক্ষণ সূত্রের কয়েকটি যথা—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'[১৪] (ভামহ), 'ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্'[১৫] (রুদ্রট), 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি'[১৬] (মম্মট), 'শব্দার্থৌ নির্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালঙ্কারৌ কাব্যম্'[১৭] (বাগ্ভট) 'অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্'[১৮] (হেমচন্দ্র)। আচার্য দণ্ডীর পক্ষপাত শব্দের উপরই অধিক—'তৈঃ শরীরং চ কাব্যানামলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ। শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী॥'[১৯] রসগঙ্গাধরে জগন্নাথের উক্তি—'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম।'[২০] ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্ধন বললেন—'সহৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্।'[২১] শব্দ এবং অর্থ, অথবা শব্দ—গুরুত্বটা যারই হোক, আসল বক্তব্যটি হল—সাধারণের ভাষা এবং কাব্যের ভাষা এ দুয়ের মধ্যে যে ফারাক তার কারণ

হল ইষ্টার্থপ্রতিপাদক শব্দই কাব্যের প্রাণ। এমন শব্দ—যা রমণীযার্থপ্রতিপাদক। এমন শব্দ—যা অনির্বচনীয় চমৎকারের জনক। তেমন শব্দের নির্বাচন ও যথার্থ বিনিয়োগ—কাব্যনির্মাণের এই হল মূলসূত্র। দণ্ডী ঠিকই বলেছেন—'গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক্প্রযুক্তা স্মর্যতে বুধৈঃ'। অর্থাৎ সম্যকপ্রযুক্তা বাণী কামধেনুর মতো অভীষ্ট প্রদান করে। মহাকবি কালিদাস সমগ্রজীবনের কাব্যসাধনার শেষে পরিণত বয়সে 'রঘুবংশ' মহাকাব্য রচনার প্রাক্কালে শব্দার্থপ্রতীতির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ'॥[২২]

কাব্যের শরীর নির্মাণে শব্দের অথবা শব্দার্থসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য অবশ্যই। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—কাব্যের আত্মা কী? প্রসিদ্ধ লক্ষণগুলি—যেগুলি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে—সেগুলির মধ্যে কাব্যাত্মার সংকেত নিহিত থাকলেও, স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ বিশ্বনাথ কবিরাজের লক্ষণে। বিশ্বনাথ বললেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' অর্থাৎ রসগর্ভ বাক্যই কাব্য। রসতত্ত্বের প্রথম উল্লেখ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। এই তত্ত্বের বিস্তার সাধন করে আনন্দবর্ধন বললেন—'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'। তাঁর মতে ব্যঙ্গ্যার্থই কাব্যের আত্মা।

কাব্যের আত্মা কী?—এই প্রশ্নের জবাবে ক্রমান্বয়ে যে প্রধান প্রস্থানগুলি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলি হল—রস, অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি ও বক্রোক্তি।

রসতত্ত্বের প্রাচীনতম প্রবক্তা হলেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। রসতত্ত্ব প্রসঙ্গে ভরতের একটি সূত্রই হল সমগ্র বিমর্শের অবলম্বন। সূত্রটি হল—'বিভবানুভাবব্যাভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'।[২৩] এই সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন—লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত। রসপদার্থটি কী এবং কীভাবে তার নিষ্পত্তি হয় সে সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণামতো ওঁরা যে ব্যাখ্যাগুলি দিয়েছেন সেগুলি কেন্দ্র করে চারটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে—লোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, নায়কের ভুক্তিবাদ ও অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। এই চারটিই অতি পরিচিত মত। আরও চারটি, মোট আটটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ পাওয়া যায় রসগঙ্গাধরে।

রস কী? রস্যতে ইতি রসঃ। যা আস্বাদন করা যায় তাই রস—aesthetic delight। কেমন করে এই রসের নিষ্পত্তি ঘটে দ্রষ্টা ও পাঠকের মনে নাটক ও কাব্যের মাধ্যমে—কেমন করে সেই পরম রমণীয়ের আস্বাদন বা উপলব্ধি হয় সহৃদয়-হৃদয়ে সেই পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণচ্ছলে যা বলা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হল এই রকমের।

—মানুষের অন্তরে স্থায়িভাবে নিহিত রয়েছে কতগুলি সংস্কার বা ভাব। এদের বলা হয় স্থায়িভাব। রতি, উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, জুগুপ্সা, ভয়, ক্রোধ, হাস—এই হল সর্বজনস্বীকৃত আটটি স্থায়িভাব। অনেকের মতে, আরও একটি স্থায়িভাব আছে—

তার নাম নির্বেদ। শ্রদ্ধা, স্নেহ ও লৌল্য এই নামে আরও তিনটি স্থায়িভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু, সমালোচকদের মতে, এরা কোনো স্বতন্ত্র ভাব নয়—শ্রদ্ধা ও স্নেহ রতির অন্তর্গত এবং লৌল্য হাসের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়িভাব রতি শৃঙ্গারে, উৎসাহ বীরে, শোক করুণে, বিস্ময় অদ্ভুতে, জুগুপ্সা বীভৎসে, ভয় ভয়ানকে, ক্রোধ রৌদ্রে, হাস হাস্যে এবং নির্বেদ শান্তে রসরূপতা প্রাপ্ত হয়ে আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়ানক, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত—এই ন-টি রসের কোনো একটি অঙ্গিরূপে এবং অন্য কোনো এক বা একাধিক রস অঙ্গরূপে সমবেতভাবে সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য হয়ে কাব্যকে কাব্যপদবী দান করে। রসতত্ত্ববাদের এটিই মর্মকথা।

অলঙ্কারবাদের পুরোধা হলেন ভামহ এবং উদ্ভট। দণ্ডী, রুদ্রট, প্রতীহারেন্দুরাজ—এঁরাও এই মতেরই সমর্থক ও পরিপোষক। এঁদের মতে,—'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'।[২৪] অলঙ্কার হচ্ছে ভূষণ। ভূষণবর্জিত রচনার আকর্ষণীয়তা থাকে না। তাই তার কাব্যত্ব উপাদেয় হয় না।—'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্'[২৫] (ভামহ)। ধ্বনিতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও অলংকারবাদীরা বলতে চান—অলংকরণই কাব্যনির্মাণের আবশ্যিক উপকরণ। বাচ্যার্থপ্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থপ্রধান, গুণীভূতব্যঙ্গ্য—কাব্যের মৌলিক চরিত্র যাই হোক না কেন, অলংকারের চাকচিক্যে চর্চিত না হলে কোনো কবিকৃতিকেই সমাদরের মর্যাদা প্রদান করা চলে না। সোজা করেই বলি, ঘুরিয়েই বলি, কায়দা করেই বলি—উক্তিবৈচিত্র্যের নানা কলা ও কারুক্রিয়া প্রয়োগ করে বক্তব্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে মন ও মেজাজ তৎক্ষণাৎ তাতে সংলগ্ন ও সংসক্ত হয়ে পড়ে—অলংকারবাদীরা এটাই মনে হয় বলতে চান। উক্তির বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন অলংকারের রূপকল্প নির্ধারণ করে গেছেন অলংকারবাদীরা। কালক্রমে তাদের নাম ও সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে। মাত্র চারটি অলংকারের উল্লেখ করেন ভরত। প্রাচীন শাস্ত্রে পাঁচটি এবং আটটি অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার পরে কোথাও আঠারটি, কোথাও ত্রিশ ও চল্লিশ প্রকারের উল্লেখ আছে। মম্মট একষট্টি প্রকার অলঙ্কারের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। রুয্যক পঁচাত্তরটি, চন্দ্রালোক একশতটি এবং কুবলয়ানন্দ একশত পনেরটি অলঙ্কার উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও আরও অনেক রয়েছে।—'সহস্রশো হি মহাত্মভিরন্যৈরলঙ্কার-প্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ'[২৬] (ধ্বন্যালোক)। অলংকার যেমন কাব্যশরীরের শোভাসম্পাদক—কাব্যের বহিরঙ্গভূষণ; তেমনি আছে কতগুলি 'গুণ'—যেগুলি কাব্যসত্তার অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের উপকরণ। দশটি গুণের কথা বলেছেন ভরত। দণ্ডীও ওই দশটি গুণের বিবরণই দিয়েছেন। ভামহ মাধুর্য, প্রসাদ এবং ওজঃ এই তিনটি গুণের কথা বলেছেন। গুণও অলঙ্কারের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন বামন—'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ।' অর্থাৎ—গুণ হল কাব্যশোভার কর্তা, সেই শোভার আধিক্য সম্পাদনের হেতু হল অলঙ্কার। অলঙ্কারের সঙ্গে গুণ এবং গুণের সঙ্গে অলঙ্কার—এই দুয়ে মিলে একটি প্রাণবন্ত রমণীয় কাব্যশরীরের

পরিকল্পনা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। গুণের কথা শুধু ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই নয়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অংগীকৃত এবং প্রচারিত হয়েছে।

রীতিবাদের আদি প্রবক্তা হলেন বামন। এই মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।'[২৭] বামনাদির মতে—উপনাগরিকা, পরুষা এবং কোমলা এই ত্রিবিধ রীতি যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী নামে পরিচিত। রুদ্রটের মতে রীতি চারটি—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটীয়া ও গৌড়ীয়া। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ছয়টি রীতির উল্লেখ রয়েছে—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ীয়া, আবন্তিকা, লাটীয়া ও মাগধী। পদসন্দর্ভের মাধুর্য বা পারুষ্য, সমাসের অল্পতা বা আধিক্য এই সব বৈশিষ্ট্যের বিচারে অঞ্চল-ভিত্তিক বিশিষ্ট পদবিন্যাসপদ্ধতিক্রমেই এক-এক প্রকারের রীতি। গদ্য-পদ্য ভেদে, দৃশ্যশ্রব্য-ভেদে, অঞ্চল ভেদে, ভাব ভেদে শব্দের প্রকৃতি ও বিন্যাসশৈলীর বৈলক্ষণ্য —এটাই রীতিতত্ত্বের সারকথা। কাব্যনির্মাণে এটিও একটি মূল্যবান মাত্রা, কাব্য-জিজ্ঞাসায় যার অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। কবিকৃতির একটি আনুষঙ্গিক চরিত্রধর্ম হলেও, রীতি কখনো কাব্যের আত্মা হতে পারে না।

'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'—অর্থাৎ বক্রোক্তি হল কাব্যের আত্মা। এই মতের প্রবক্তা হলেন কুন্তক। কুন্তকের মতে—বক্রোক্তি হল এমন ধরনের ভাব ও ভাষা যা অত্যন্ত প্রচলিত সাধারণ অর্থ ও বাগ্‌বিন্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বৈদগ্ধ্যপ্রসূত অনিতরসাধারণ বাচনশিল্প কাব্যে অপেক্ষিত—এ কথা মেনে নিয়েছেন অনেকেই, কিন্তু তাই বলে মেনে নেওয়া চলে না যে—বাগ্‌বিষয়ক বৈদগ্ধ্য বা নিপুণতা বা অসাধারণত্বই (যাকে বক্রোক্তি বলা হয়েছে) কাব্যের আত্মা।

'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'[২৮]—আনন্দবর্ধনের এই উক্তির তাৎপর্য রসতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধেয়। রসও একটি ব্যঙ্গ্যার্থ। একটি সমগ্র নাটকে বা কাব্যেই শুধু একটি রসের পরিস্ফুরণ সম্ভব, সীমিত ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর নয়। কাব্যশিল্পে একমাত্র রসের অনন্যত্ব বা ঐকাধিপত্য মেনে নিলে, লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ বর্তায়। এই কারণেই, শুধু রসধ্বনি নয় ধ্বনিমাত্রই কাব্যের প্রাণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ধ্বনিকার। কথাটা এই অর্থে সংগত বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই লক্ষণকেও অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট বলে অনাদর করেছেন অনেকেই। তাঁদের মতে, ধ্বনিশূন্য যে রচনা, অথবা ধ্বনি অপ্রধান যেখানে এমন রচনা—এদেরও কাব্য বলে স্বীকার না করার কোনো যুক্তি নেই।

ভারতীয় কাব্য জিজ্ঞাসার প্রায় দু হাজার বৎসরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় অনেক বিচার-বিমর্শ, অনেক বাদ-বিবাদ ও মতামতের সম্ভার সঞ্চিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে—কাব্যের স্বরূপ ও কাব্যসংক্রান্ত বহুবিধ বিষয়ের বহুমুখী চিন্তাভাবনার ভিতর দিয়ে ভারতীয় তাত্ত্বিকেরা সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অজস্র মূল্যবান সিদ্ধান্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন। রস, অলঙ্কার, রীতি, গুণ, ধ্বনি প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় উপস্থাপিত ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

যিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা করেছেন, তিনি তার উপরই জোর দিয়েছেন। মনে হয়েছে ওটিই বুঝি চরম ও চূড়ান্ত কথা। কিন্তু ওইভাবে দেখলে ও ভাবলে ভুল করা হবে। কাব্যের সত্তাকে কেন্দ্রবিন্দু করে সমস্ত বিষয়সামগ্রীকে সমন্বয় সূত্রে তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পারলে একটি অখণ্ড সুসমঞ্জস সত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কাব্যজিজ্ঞাসার প্রথম প্রশ্ন হল—কাব্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর—চমৎকারজনক বাঙময় সৃষ্টিই কাব্য। কাব্যসত্তার মৌল আবেদন সহৃদয়-হৃদয়। সংবেদনশীল রসিকচিত্তে অসংজ্ঞেয় অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি সঞ্চারিত করাই কাব্যের ধর্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ সদ্-বস্তুরূপে কাব্যকে কল্পনা করে, তার অন্তরঙ্গ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য যে সকল কলা কৌশলের উপদেশ কাব্য-বিশারদেরা দিয়েছেন—অলঙ্কার, রীতি, গুণ, ধ্বনি ইত্যাদি—তাদেরও স্ব-স্ব-স্থানাংকগত যথার্থ উপযোগিতা অবশ্যই প্রণিধেয়—কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। ভারতের শিল্পতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্ব তার অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত। আর তাই বিশ্বচেতনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবন-চেতনা তথা সমাজচেতনা এই নন্দনতত্ত্বের মর্মবীণায় নিত্য অনুরণিত। চমক চারুতা ও চাকচিক্যের সহস্র আভরণ ও উপায়-উপকরণের আড়ম্বর ছাপিয়ে আনন্দঝরা কল্যাণদৃষ্টি প্রাণময়ী কাব্যপ্রতিমার সর্বাঙ্গ থেকে অনায়াসে উপচে পড়বে—ভারতীয় নন্দনচেতনার এইটিই অনন্যা অন্বেষা।

---

১. সবাই সুখী হোক, সবাই নিরাময় হোক। সবাই মঙ্গলের অধিকারী হোক। কেউ যেন দুঃখ না পায়।
২. রামাদির ন্যায় আচরণ করতে হবে, রাবণাদির ন্যায় নয়।
৩. সহভাবযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।
৪. দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য উভয়ই ক্রীড়নীয়কের ন্যায় (আনন্দদায়ক) হবে।
৫. বেদ বিদ্যা ও ইতিহাস অবলম্বনে রচিত আখ্যান নাট্যরূপে আনন্দ উৎপাদন করবে।
৬. প্রীতিই প্রধান…প্রধানত আনন্দের কথাই উক্ত হয়েছে।
৭. প্রীতিই রসের আত্মা এবং তাই নাট্য।
৮. সকল প্রয়োজনের মৌলিভূত হল আনন্দ। তৎক্ষণাৎ রসাস্বাদন সমুদ্ভূত এই আনন্দে অপর সকল বস্তুর বোধই বিগলিত হয়ে যায়।
৯. নৈসর্গিক প্রতিভা, নির্মল শাস্ত্রাদিজ্ঞান, নিরন্তর অভ্যাস—কাব্যসম্পদের এগুলিই কারণ।
১০. শক্তি, লোক শাস্ত্র ও কাব্যাদির জ্ঞানজনিত নিপুণতা, কাব্যবিধায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির শিক্ষানুসারে অভ্যাস—কাব্যসৃষ্টির এগুলিই হেতু।
১১. একমাত্র শক্তিই কাব্যের হেতু—ইহাই যাযাবরীয় মত।
১২. কবিদের প্রতিভাই কাব্যকৃতির কারণ। ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস কাব্যের সংস্কারকারক, হেতু নয়।
১৩. কবিগত প্রতিভাই একমাত্র কারণ।
১৪. সহভাবযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।
১৫. শব্দার্থযুগলই কাব্য।
১৬. দোষবর্জিত গুণযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য—কদাচিৎ অলংকারের অভাব ঘটলেও তা কাব্য।
১৭. দোষবর্জিত, গুণমণ্ডিত, প্রায়শ অলংকারযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।

১৮. দোষবর্জিত গুণমণ্ডিত অলংকারযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।
১৯. তাঁরা (কাব্যশাস্ত্রজ্ঞগণ) কাব্যের শরীর ও অলংকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ইষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলই কাব্যের শরীর।
২০. রমনীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দই কাব্য।
২১. সহৃদয়গণের আহ্লাদজনক-শব্দার্থময়ত্বই কাব্যের লক্ষণ।
২২. বাক্ ও অর্থের সম্যক জ্ঞানের নিমিত্ত (আমি) বাক্ ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত পার্বতীপরমেশ্বরকে বন্দনা করছি।
২৩. বিভব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে।
২৪. অলংকার থেকেই কাব্যের গ্রাহ্যতা।
২৫. বনিতার মুখ কান্ত হলেও ভূষণশূন্য হলে শোভা পায় না।
২৬. অন্য মহাত্মারা সহস্রপ্রকারের অলংকার সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।
২৭. রীতিই কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদরচনাই রীতি।
২৮. ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। □